# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

## 18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No : KLMLGK 200 | Place of Publication : ৩৩/২ এ. হীরেন সেন সরণী, কল-৬ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : মহাশ্বেতা সান্যাল (1, 2) অতনুময় সান্যাল (2/1) |
| Title অ (A) | Size 8.5"/5.5" |
| Vol & Number 1<br>2<br>2/1<br>2/3<br>3/1 | Year of Publication : Aug 1981<br>Nov 1981<br>Aug 1982<br>Feb 1983<br>Aug 1983 |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor অতনুময় সান্যাল | Remarks |

C.D. Rol No. KLMLGK

# অ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা/আগস্ট, ১৯৮৩

এ সংখ্যায় লিখেছেন : নন্দিতা সেনগুপ্ত, জ্যোর্তিময় সেনগুপ্ত, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব কোলে, অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপম চক্রবর্তী, অনিলেন্দু চক্রবর্তী, বার্ণিক রায়, শতরূপা সান্যাল, তরুণ মুখোপাধ্যায়, হীরক সেনগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, তাপস তলাপাত্র, অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : শতরূপা সান্যাল

# সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক যে ঘটনা ভারতবর্ষের মানুষকে সবচেয়ে ঝাঁকনি দিয়েছে, আতঙ্কগ্রস্ত করেছে তা হল শ্রীলঙ্কার তামিল নিধন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লজ্জাজনক আর কিছু মানব সভ্যতায় নেই। তাই শুধু ভারতীয় বলেই নয় এই ধরণের যে কোন হিংসাত্মক লড়াই বা আক্রমনই আমাদের কাছে অত্যন্ত নিন্দার্হ। যত বড় রাজনীতির খেলাই থাক না কেন—উলুখাগড়ার প্রাণ নিয়ে যথেচ্ছাচারের দিন শেষ হবেই। কেননা অন্ধকারের পরেই থাকে আলো, রাতের পর দিন। এই দেশ থেকেই একদা মহান বুদ্ধের শান্তিবাণী ছড়িয়ে গিয়েছে সারা বিশ্বে। আজ আবার তাকে ছড়িয়ে দেবার বড় প্রয়োজন।

'অ' যখন তৃতীয় বছরে যাত্রা শুরু করল তখন চতুর্দিকে অশান্তির অন্ধকার ঘিরে আসছে। ভারতবর্ষের চতুস্পার্শের এবং বহির্বিশ্বের পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত। প্রচারধর্মী রচনায় আমাদের অবিশ্বাস এবং সন্দেহ অথচ সময় তখন উত্তাল। কবি লেখক সাহিত্যিক বন্ধুরা এখন কি লিখবেন ?

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

# কবিতা

## যা চাই / নন্দিতা সেনগুপ্ত

দু'হাতে আঁজলা
যত পাপ যত বিষ
যা কিছু বিষাদ দুঃখ শোক
জীবনের ঘাটে চলাচল
সে সব নিলাম তুলে
একদিন সূর্যমুখী হবো।
দু'পায়ে মাড়িয়ে যাই
যত ক্ষোভ, দুঃখে ঝরা পাতা
দিনযাপনের দুঃখ, জীবনের গ্লানি যা জাগর
সে সবকে পিছে রেখে
আকাশে দেওদারুর ঘাড় একদিন তুলে
সে আকাশ ছোঁব।

## বিপ্রতীপ / জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

একটি সমুদ্র আঁকো—
যার ছিলো আবেদন মানচিত্রে অস্থির প্রার্থনা।
অর্ণব ভাসানো ঢেউ খেলা,
ফিরে গেছে তারপর কি কৌশলে কোন সে মোহনা
অববাহিকার পথে শীর্ণতট উৎসমুখ ঘিরে
ঢেলে দিতে ফেনাভরা তিক্তস্বাদ লবণ যন্ত্রণা।
একটি পশুকে ভাবো—
যে ছিল অরণ্যচারী তৃপ্তসুখ অতঃ শৃংখলিত,
করেছে কি সে কখনো আশা
মগ্নস্মৃতি বনানীর ছায়াছায়া সীমানা পেরিয়ে
সন্তর্পিত ধীরগতি সর্পিল অথচ সংগোপনে
আবার সবুজ ঘরে পায়ে পায়ে স্নিগ্ধ ফিরে আসা।

একটি কবিতা লেখো—
এমন কারুর জন্য তোমার যন্ত্রণা,
যন্ত্র না হয়ে যার মৎস্যগন্ধা প্রাণ
আকাশ পুকুর সাঁতরে জানালার পারে এসে ফের
আবার হয়েছে তীক্ষ্ণ বর্শি টোপ হুইলের টানে
ডিপ ফ্রিজে শূন্যতাপ যন্ত্রসিদ্ধ অভ্যর্থনা

## রমণীয় যন্ত্রণা / শিবেন চট্টোপাধ্যায়

অনেক যন্ত্রণা বুকে
পৃথিবীর প্রথম রাজপুত্র
যে ইরামত গাঁথতে গিয়েছিল
তার ভিতরটা
আজো দাঁড়িয়ে আছে।
একটা ভয়ংকর অন্ধকার বাজপাখী
সেখানে উঠে এসেছে
পৃথিবীর আদিম ইতিহাস থেকে।
রমণীয় কোন কিছুই
আজ অনুভব করা যায় না
তবু বৃদ্ধ সূর্য
একটা জটিল দগদগে ক্ষত বুকে নিয়ে
চিরকাল নিদারুণ জ্বালায় জ্বলছে আর জ্বলছে।
শুধু ভালবাসার নীলকান্ত মণিটাকে
আজো খুঁজে পেলাম না।

———



## তোমার ভূমিতে দাঁড়িয়ে / অপূর্ব কোলে

ইদানীং তোমার কথা মনে পড়লেই
মেঘের মত কম্পিত হয়ে ওঠে
হৃদয়ের অলিন্দ নিলয়।
আমার সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।
বিশুদ্ধ বিস্তীর্ণ তোমার ভূমিতে দাঁড়িয়ে
আমি কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে
পারি না বলে, কেঁদেছি।

## তিনি অনুপস্থিত / অসিত চট্টোপাধ্যায়

তিনি হৃদয়ে বড় ভালবাসতেন
তাঁর চতুর্থ পেরেকটি এখন আমার হৃদয়ে
ডুবিয়ে পা
তিনি অভিমানকে পুষে রাখতেন
উজ্জ্বল অহংকারকে চোখের ফলায়
আপোষহীন
সন্ধ্যে হলে
একে একে দলছুট সবাই
পুনশ্চ হাঁসের ভেড়িতে
সূর্য সকালে ওরা এই ভেড়িটকে চিনেছিলে।
গারদ বলেই
তিনি ফিরে এলেন না
চো—
রাস্তার মোড়ে তাঁর মূর্তি গড়ে
আমি বসে আছি

## তাৎপর্যবিহীন / অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংযোজক তারগুলো পুড়ে ছাই। ডিনামাইটে ঘটল না বিস্ফোরণ। শুধু শিমুলের ফল ফেটে-ফেটে, চারিদিকে ব্যর্থ তুলায় আঁশ। অথচ সেই আঁশ গায়ে মেখে, ক্ষুদ্র জন্মের স্নিগ্ধতায় তোমার প্রতিদিনের বক্তব্য রাখা। মানচিত্রের ছড়ানো দাগের মতো আমার শিরা উপশিরায় এখন তীব্র অনুভব—যখন সারি সারি স্কাইস্ক্রাপার, তরতরে সাজানো রাজপথে-বাইপাসে অবিরত আসে যায় মোটর, স্কুটার, ট্রলিবাস। তবু নিয়ত করে অশ্রু ঝরে। সেই অশ্রুর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে নদীর কাছে গেলে—গলুই এর হাতে হাতে ঘোরে জ্বলন্ত হুঁকো, বাকী সব অন্ধকার, নদী শুধু একা একা কথা বলে। সবই যেন তাৎপর্যবিহীন মনে হয়।

## ঈশ্বরের মত পরিপার্শ্ব / অনুপম চক্রবর্তী

ঈশ্বরের মত প্রাজ্ঞ,
আমাদের পরিপার্শ্ব, তর্জনী উঁচিয়ে
বলেছিল,
দেখো অনুপম,
তোমার জন্ম হল বিশের শতকে
তোমার নির্দিষ্ট স্থান
ছ ইঞ্চি ব্যাস এক মধ্যবিত্ত টব।
এতেই ঘাসের মতো বেঁচেবর্তে থেকো।

শোনো অনুপম,
ফুলের সুবাস আর পাখির কাকলী
সুনীল আকাশ
আজ থেকে শত্রু বলে জেনো।
বোঝো অনুপম,
উপরি বর্ণিত মত বিধি ও নিষেধ
জ্ঞানবৃক্ষের ক্ষতিকর ফল বলে মেনো।



আমি দেখলাম
আমি শুনলাম
আমি বুঝলাম

তবু কিভাবে কিভাবে যেন কিকরে কখন
চরম অশুভ এক মাহেন্দ্রবেলায়
বসন্তের দিনে
জানা শোনা হয়ে গেল
ফুল পাখি আকাশের সাথে।

তারপর
তিনজন বন্ধুর প্ররোচনাক্রমে
শেকড় ছাঁড়য়ে গেল মাটির গভীরে
শাখাকাণ্ডে জমা হল কাণ্ডজ্ঞানহীন
নিষিদ্ধ অবাধ্যতা।
শেকড় ফাটিয়ে দিল মধ্যবিত্ত টব।

শোনো অনুপম—
পরিপার্শ্ব শাপ দিল বিধাতার মত
শেকড়ের নীচে আর মাটি পাবে না।
ঘাস হয়ে বটগাছ হতে চেয়েছিলে
ত্রিশংকু হও তুমি নিরলম্ব হয়ে॥

## ঘরে এবং বাইরে / অনিলেন্দু চক্রবর্তী

বন্ধ ঘর—
চারটা দেওয়ালের মধ্যে এক নিশ্চল জগৎ।
জানলাটা খুলে দাও,
বাইরটা হাত বাড়াক।

বাইরের হাওয়া এসে টোকা মারছে।
দরজাটা খুলে দাও—
বাইরটা ভিতরে ঢুকুক।

আঙ্গিনাটা ছটপট করছে,
ফটকটা খুলে দাও,
বাইরে পা বাড়াক।

এবার পথেই বেরিয়ে পড়েছ তো,
এগিয়ে যাও চৌরাস্তার মোড়ে—
সেখানে সমাধান হবে অনেক সমস্যার,
কিংবা সমস্যাই থাকবে না আর।

## বৃষ্টি স্নান / বাণিক রায়

স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্নেরা কুয়াশা হয়ে এ জগতে
আমরা কী নিয়ে বেঁচে আছি ঃ
দুঃখ ব্যথা জ্বালা ভয় উদ্বেগ সংশয়
পরাজিত আলোর ছায়ার ঘৃণার উষ্মার ঘায়ে
বেঁচে আছি, নোংরা রাস্তার কাদা ছিটকে এসে ঘরে লাগে ঃ
মৃত্যু নিয়ে বেঁচে আছি।

পাহাড়ের জলহীন কঠোর পাথর শুষ্ক কালো
কঠিনতা নিয়ে চেয়ে থাকে
গোপন ঝোরার দিকে উৎকর্ণ হয়ে মহাশূন্যে,
অজানা পাহাড়ি ফুল কঠিন পাথরে সর্বদা লতিয়ে ওঠে,
শুকনো ডাঁটার ফুলে হাসির কঠিন ছায়া পড়ে,
বিদ্যুৎ চমকে যায় পাহাড়ে পাহাড়ে,
ওপরে কুয়াশা ধোঁয়া, মেঘ, নীল বাষ্পের আকারে
শুয়ে আছে আমাদের নির্জন কল্পনা।
প্রবল বর্ষণে মাটি ধসে পড়ে, প্রচন্ড বাতাস,



পাথরের চাঁই শূন্যে ঝুলে থাকে একা
কোনো রুমে গাছের শিকড় ছুঁয়ে।
ভয় হয়, ভয় হয়, এ কি আমি ? তুমি ?

পাথরে লতানো ফুল বৃন্তিস্থানে নক্ষত্র আলোয়
চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

## টিলার উপরে দাঁড়ালেই / শতরূপা সান্যাল

টিলার উপরে দাঁড়ালেই
দূরের আকাশ আরো দূরে
চেনা ঘাস ফুল সরে যায়
বাঁশের পাতার ফিসফাস্
টিলার উপরে দাঁড়ালেই।

ভোরবেলা রাত সুতো থেকে
দোলে দিন পদ্মরাগ মণি
আঙুলে জড়াবো বলে ভাবি—
সুতো ছিঁড়ে আকাশে উধাও
তার দিকে হাত বাড়ালেই।

যেমন মৃতের ঠোঁট থেকে
কথা ভালবাসা মুছে যায়
যেমন ওদিকে তাকালেই
সব দূরে পুড়ে উড়ে যায়
একটুকু হাত বাড়ালেই
টিলার উপরে দাঁড়ালেই।

# প্রবন্ধ ঃ

## রবীন্দ্র দৃষ্টিতে রামমোহন রায় ঃ এক ভ্রান্ত মূল্যায়ন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

"ভারত-পথিক রামমোহন" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আবেগ নিয়ে রামমোহন সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি এক-কে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। পৃথিবীর অন্যসব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেননি, তাঁর সমস্ত জীবন দিয়েই সেই এক-কে সত্যকেই চেয়েছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি ও মূল্যায়ণ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের মনে রামমোহন সম্পর্কে একটি ভাবমূর্তি তৈরী করে রেখেছে যা মহান, সুন্দর, স্বর্গীয়। অথচ দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়ণে সত্যের অপলাপ করেছেন। সম্ভবতঃ রামমোহনকে তিনি তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেই বিচার করেছিলেন। কেননা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রাজা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান। অন্যদিকে, ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের পিছনে রামমোহনের বিশেষ ভূমিকা যে ছিল (শেষ পর্যন্ত তা' রামমোহনের জীবন ও কৃত্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও) তাকে ঠাকুর পরিবার অগ্রাহ্য করতে চাননি। উপরন্তু, রামমোহনের 'নেগেটিভ' দিককে প্রাধান্য দিলে ব্রাহ্মধর্ম তথা ঠাকুর-পরিবারের 'ইমেজ' ও নষ্ট হতে পারে, এ আশংক রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। তাই তিনি 'ভারতপথিক' বলে রামমোহনের এক মহৎ মূর্তি ভারতীয় তথা বাঙালী-মানসের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন ও সার্থক হন। কিন্তু তিনি রামমোহনকে এতই বিপরীত কোটিতে স্থাপন করেছেন, যে, আজ তাঁর উৎকলিত ঐ মন্তব্যকে আর আমরা সশ্রদ্ধভাবে মেনে নিতে পারি না। রামমোহন তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁরই কর্ম ও চিন্তার সর্বদা বিরোধিতা ক'রে গেছেন। আমরা শুধু তারই কিছু পুনর্বিচার করব এবং রবীন্দ্রকথিত উক্তির ভ্রান্তি দেখাব।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, রামমোহন নাকি সমস্ত জীবন এক-কে, সত্যকে চেয়েছেন। যার সঙ্গে রামমোহন জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কলেটের বক্তব্যের মিল পাই "The root of his life was religion." বাহ্যতঃ রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি', 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপনে এবং প্রসঙ্গে ধর্মগ্রন্থ ও খৃষ্টধর্ম নিয়ে কূট তর্কবিতর্ক রচনা ইত্যাদি দেখেও ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যে, রামমোহন একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু। যদিও রামমোহন



সত্যকার কোনো ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন না। মোহিতলাল মজুমদার স্পষ্টই বলেছেন, "তাঁহার 'ভাবের ঘরে' চুরি ছিল, তিনি ভিতরে যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাহিরে তাহা খোলাখুলি স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না।" এ মন্তব্য যথার্থ।

যে রামমোহন রায় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি ভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, তিনি কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মসভার উপাসনায় কোনো অব্রাহ্মণকে প্রবেশাধিকার দিতেন না। সেই ঘরে উৎসবানন্দ তর্কবাগীশ পড়তেন উপনিষদ। অথচ রামমোহন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে অগেষ্ট যে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেন, তার পাট্টা বা অর্পণনামায় ঘোষণা করেন ব্রাহ্মসমাজে ও উৎসবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনা করবে। আর সেই রামমোহন যখন নিয়মনীতি বেঁধে উপনিষদ পাঠ করান ও শুধু ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার দেন, তখন তিনি কিন্তু নিজের নির্দেশকেই অমান্য করেন। আবার, জাতিভেদ অখণ্ড হিন্দু-সমাজ স্বাদেশিকতার পরিপন্থী ঘোষণা করেও তাঁর চোগা-চাপকানের আড়ালে রামমোহন আমৃত্যু কিন্তু যজ্ঞসূত্র পৈতেটি সযত্নে রেখেছিলেন। পাশাপাশি, বিহিত মদ্যপানেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

সতীদাহ প্রথা রদ করার ব্যাপারেই রামমোহনের সর্বাধিক খ্যাতি। যদিও দুর্মুখ ইতিহাস রামমোহনকে সে সম্মান থেকে বঞ্চিত করতেই চায়। এমন কি রামমোহনের অব্যবহিত পরে আবির্ভূত মহামতি বিদ্যাসাগর পর্যন্ত রামমোহনের সতীদাহপ্রথা রদ করার ভূমিকা প্রসঙ্গে নিশ্চুপ ছিলেন। একথা সত্য যে, 'সতীদাহপ্রথা অশাস্ত্রীয়' এ নিয়ে রামমোহন বিস্তর তর্কবিতক, করেন ও 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের সংবাদ' ইত্যাদি বইও লেখেন। অথচ আইনের হস্তক্ষেপ তিনি চাননি। মানুষ স্বেচ্ছায় ও ধর্মভয়ে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করবে এই অলীক বিশ্বাস রামমোহনের মতো যুক্তিবাদী বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করতেন। ফলতঃ লর্ড বেন্টিঙ্কের আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টাকে তিনি মেনে নেননি ও বাধা দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সতীদাহ প্রথা বেআইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রামমোহনই লর্ড বেন্টিংককে 'deepest gratitude' জানিয়ে চিঠি দেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অভিমত অর্থহীন, ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। যিনি এক-কে, সত্যকে জেনেছেন তাঁর ধর্ম, ঈশ্বরভাবনা তথা কর্মে কেন এত সব বিরোধ থাকবে? ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, "To day this creed is a stading mystry".

রামমোহন টাকাকড়ি বা খ্যাতির প্রতি যে উদাসীন রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ষোল আনাই অসত্য। তবু যে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চারে রামমোহনের গুণগান

করেছেন, বারংবার রামমোহনকে স্মরণ করেছেন, এর পিছনে দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ উনিশ শতকে রামমোহনের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব যে কাউকেই অভিভূত করতে পারত। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং রামমোহনের অনুরাগী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের উত্তরসাধক ছিলেন। সেক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্কানুসরণ রবীন্দ্রনাথ বাঞ্ছিত মনে করতেন। এ ব্যাপারে কোন তর্ক, প্রশ্ন, বিচারকেই তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বৈষয়িক সূত্রে রামমোহনের যে সখ্য ছিল, তাতে দুজনেরই অর্থোপার্জনের পশ্চাৎপট খুব মনোহর ও অনাবিল ছিল না। যদিও কোনো ধনী ব্যক্তিরই ধনবৃদ্ধির পথ খুব সুনির্মল হতে পারে না। কিন্তু দ্বারকানাথ ও রামমোহন এব্যাপারে আরেকটু প্রাগ্রসর ছিলেন। ইংরেজকে তাঁরা বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষার 'চিত্তদূত' ভেবে নয়, অর্থোপার্জনের সহায় ভেবেই। যে কারণে পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের বৈষয়িক কাগজপত্র ভস্মীভূত করতে বাধ্য হন রবীন্দ্রনাথ এবং "যোগাযোগ" উপন্যাসে 'তিনপুরুষের কাহিনী, শুরু করেও মাঝপথে অকস্মাৎ বন্ধ করে দেন। এক্ষেত্রে 'পারিবারিক মর্যাদা' রক্ষাই তাঁর কাছে বড় ছিল। পাছে এ নিয়ে কেউ তাঁকে কূটে প্রশ্ন করে. এজন্য তিনি "ভারতপথিক রামমোহন" গ্রন্থে বেশ তিরস্কার ও উষ্মার সঙ্গে বলেছেন, যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্যপথ নেই।' (পৃঃ ৭৭) বোঝা যায়, বেশ সচেতনভাবেই রবীন্দ্রনাথ রামমোহন প্রসঙ্গে সমস্ত বিতর্ক এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কোনো মানুষ (মহামানব হলেও) সম্পর্কে মূল্যায়ন কখনোই একতরফা হতে পারে না। ভালোমন্দ দুইই দেখা দরকার। এবং এতে অসম্মানের প্রশ্ন আসে না। বরং সত্য বিকৃতির দায় থেকে মুক্তি পায়। অন্যদিকে, এটাও মনে হয়, হয়ত সেইসময় রামমোহনকে জনগণের সামনে উজ্জ্বল করে তোলার দরকার ছিল দেশ ও দশের স্বার্থে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হোয়াইটওয়াই' তার প্রচার করেই। তবু বারংবার রবীন্দ্রনাথ যেভাবে রামমোহনকে রক্ষা করার দায়িত্ব একা নিয়েছেন, তাতে মনে হয়, রামমোহনের এমন কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি তিনি জানতেন, যাঁর জন্য তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীকে সপ্তকে চড়াতে হয়েছিল।

রামমোহন যে টাকাকড়ির ব্যাপারে একটুও উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ কলকাতায় তাঁর দুটি বাড়ী ছিল—চৌরঙ্গী ও মানিকতলায়। তিনি যেমন পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেছিলেন, তেমনি নিজেও অর্থ ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করে ছিলেন। তিনি তেজারতি তথা সুদের ব্যবসা করতেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় কোম্পানীর একজন সিবিলিয়ান উডফোর্ডকে পাঁচ হাজার



টাকা ঋণ দেন। এরকম ঋণ দানের ঘটণা অজস্র আছে। শুধু এ ঘটণাটির উল্লেখের কারণ এই যে, সেই সময় রামমোহনের পিতা রামকান্ত ও বড় ভাই জগমোহন খাজনার টাকা দিতে না পারায় তাঁদের জেলবন্দী হতে হয়। এবং তাঁরা সেই সময় রামমোহনের কাছে মুক্তিপণের অর্থ চেয়েও হতাশ হন। অবশেষে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের বড় ভাই জগমোহনের বিস্তর কাকুতি-মিনতির পর রামমোহন তাঁকে সুদের শর্ত করিয়ে এক হাজার টাকা ঋণ দেন। এমন-কি ভাইপো গোবিন্দপ্রসাদকে তার সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেও রামমোহন দ্বিধাবোধ করেন নি। মাতা তারিণী দেবীকে তিনি যে তীব্র অভিযোগে বিদ্ধ করেন, তার মূলেও ছিল সেই সম্পত্তি ও টাকাকড়ির প্রতি রামমোহনের লোভ রামমোহনের আর্থিক সচ্ছলতা প্রসঙ্গে Rev. K. S. Macdonald মন্তব্য করেছিলেন, 'during the ten years he (Ram mohan Ray) was Dewan, he is said to have saved so much money as to enable him to purchase an estate worth 1,000 a year or 1,000 Rs. month a matter weich is not supposed to add to his fame,' যদিও পরপর্তী কালে জানা গেছে, দশ বছর নয়, মাত্র এক বছর নয় মাস সরকারী চাকরী তিনি করেছিলেন। তিনি ডিগ্রীর ব্যক্তিগত দেওয়ান ছিলেন। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের source of income ছিল সরকারী চাকরি, জমিদারি, ব্যবসা তথা সুদের কারবার। আর এই অর্থোপার্জনের পথ সর্বদা সৎ, পরিচ্ছন্ন ছিল, এ কথা বলা যায় না। সুতরাং টাকাকড়ির প্রতি রামমোহন অন্যান্য মহাপুরুষদের মতো (যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন, 'টাকা মাটি মাটি টাকা') দৃকপাত করেন নি, এ কথা সত্য ব'লে মানা যায় না।

বিলাতে থাকাকালীন রামমোহন যেভাবে থাকতেন, তা' মোটেই সাধারণ বাঙ্গালীর জীবন যাপন নয়। যদিও "চরিত্রপূজা" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ "বিদ্যাসাগর-চরিত" আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব আচার-আচরণের তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছেন, "বেশভূষায়, আচার ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙ্গালি ছিলেন।" (পৃঃ ১৬) বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এই অভিমত ষোল আনা সত্য হলেও, রামমোহন সম্পর্কে নয়। রামমোহনের ফটোগ্রাফ তৈলচিত্র যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ঐ শিরোভূষণ ও চোগাচাপকান পরিহিত মানুষটিকে দেখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম বোধ করেছেন। কিন্তু পোষাকে বাঙ্গলীয়ানা ছিল কি? বিলাতেও রামমোহন তাঁর ঐ রূপ, ব্যক্তিত্ব ও পোষাকের জন্যই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন খ্যাতানামা অভিনেত্রী ক্যানিকেম্বলের ডায়েরীতে যা লেখা আছে

তা' তুলে দিচ্ছি, "His appearance is very striking. His pictureque dress and colour make, of course a remarkable object in a London ballroom." রামমোহনের এই "Picturesque dreess and colour" শুধু বিদেশেই নয় স্বদেশেও দ্রষ্টব্য ছিল। রামমোহনের আচার-আচরণও সবটাই বাঙ্গালী সুলভ ছিল না। তিনি দেবদেবী মানতেন কি মানতেন না এ নিয়ে বাঙ্গালীর প্রকাশিত হয় না। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক আচার সর্বদা বাঙ্গালীর মতো নয়। যেমন মদ্যপানকে বাঙ্গালী কখনোই তাদের ঘরানা বা ঐতিহ্য মনে করে না। রামমোহন নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কারো মতে তিনি তন্ত্রমতে দীক্ষিত ছিলেন বলেই মদ্যপান ছিল তাঁর সাধনার অংগ। একথা সত্য হলে ব্রহ্ম তথা নিরাকার সাধক হিসেবে রামমোহনের গুরুত্ব একেবারেই থাকে না। আবার রবীন্দ্রকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ সাহিত্য" গ্রন্থে আধুনিক চিন্তা-চেতনার সপক্ষে দাঁড়িয়ে রামমোহনের মদ্যপানকে সমর্থন করতে তৎপর হয়েছেন—"এ কথা অবিদিত নয় যে, রামমোহন সুরাপান করতেন; কখন ও মাত্রাতিরিক্ত হতো না। একবার তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কেহ তাঁকে অতিরিক্ত পানীয় দেন, তজ্জন্য তিনি বহুমাস তাঁর মুখদর্শন করেন নি।' অন্যদিকে, রামমোহনের নিজস্ব ব্যাখ্যা হলো, 'লোলুপ হয়ে মদ্যপান করলে, নরকে যেতে হয়; যাতে চিত্তের বিভ্রম হয় এমত পান করলে সিদ্ধি হয় না।' শাস্ত্র ও আধুনিকতার দোহাই পেড়ে এ ধরণের বালকোচিত যুক্তি হাস্যকর। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে মদ্যপান, পরস্ত্রীগমণ তো আছে। তাই বলে সকলেই যদি সেটা 'পরিমিত আকারে' শুরু করে, তবে তা দেশের দারুণ দুর্দিন শুরু হবে। সুতরাং রামমোহন যা করতেন, তাকে সেইভাবেই বলা দরকার। তিনি যা তিনি তাই। তাঁকে অতিরঞ্জনে রঞ্জিত করাই 'সত্য-কে' বিকৃত করা। মানুষ ভালোমন্দ মেশা—এই সত্যটুকু মেনে নিয়েই মহাপুরুষদের সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাবান হতে হবে। এবং তাঁদের কৃতকর্মের আলোচনা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত রামমোহন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর জন্য যা করেছিলেন তার মূল্য বিচারই প্রয়োজন। অনর্থক বড় বড় বিশেষণে তাঁর সত্যমূর্তিকে আড়াল করার মানেই দেশবাসীর কাছে তাঁকে পরোক্ষে ছোটকরা। কেননা যেদিন সত্য ও তথ্য প্রকাশিত হবে সেদিন রামমোহনের প্রকৃত কর্মগুলি-ও অভিযোগের ঘোলাজলে তলিয়ে যেতে পারে। তাই রামমোহন সম্পর্কে নিরপেক্ষ পুনর্বিচার ও মূল্যায়ন সত্যিই প্রয়োজন।

[ লেখকের সংগে সমস্ত বিষয়ে যদিও একমত নই তবু বিতর্কিত বিষয় হিসাবে প্রবন্ধটি ছাপা হল। পাঠকের মতামত আহ্বান করা হচ্ছে। ] স. অ



# গল্প

## আত্মদর্শন বা আত্মহনন—হীরক সেনগুপ্ত

অমন সচরাচর বড় দল আমাদের আর হয় না। হ'ত সে অনেক-অনেক আগে যখন সবাই কলেজে টলেজে পড়তাম। হিমাংশুর ঘরে বসে থাকতে থাকতে অনেক কথাই মনে আসছিল উজ্জ্বলের। এখন কেমন যেন স্বপ্নের মতন লাগে সে সময় সময়। কাদের ভিড়ে, কোথায় হিমাংশুর ঘরে জমায়েত হয়ে আড্ডা মারার ছবি, মন থেকে উড়ে গিয়েছে; জেজানে।

আমরা যারা আজ হিমাংশুর ঘরে, তারা কেউই অস্বীকার করেনি যে আমাদের কক্ষ পথে অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এ নিয়ে নির্বোধ এর মতন নস্টালজিক টেন্ডেন্সিও নেই আমাদের মধ্যে। কারও না। আজও আমরা যে যার গৃহ নিয়েই হয়ত ব্যস্ত থাকতাম, নেহাৎ মণীন্দ্র সকাল বেলায় ফোন করল, তাই। ওই সবাইকে জুটিয়ে আনল ফোন টোন করে।

কেউই কোন বিশেষ গল্প করছিল না। তবুও সবাই ব্যস্ত ছিল। মৃগাঙ্ক এখনও বিয়ে করেনি; ইন্দ্রানী তাই নিয়ে রসিকতায় মেতে আছে। ইন্দ্রাণী-কমলেশ এখন স্বামী-স্ত্রীর সং ভূমিকায়।

"কি রে উজ্জ্বল; অনির্বাণ এখনও এল না—অনিন্দিতা জিজ্ঞেস করে।

—হিমাংশুর বাড়ী আমার পথে একবার নক করে এলাম, মা বল্লেন ও কি একটা কাজে বেড়িয়েছে, দুপুরের মধ্যেই হিমাংশুর বাড়ী চলে যাবে।

—ওকে সেদিন কলেজ স্ট্রীটে দেখলাম। কী অবিশ্বস্যে মোটা হয়েছে রে।

—হবে না। কন্ট্রাকটারীতে ঢালাও পয়সা, শুনছি ফিনিবাস বের করছে।

—অথচ ও বলত, ভারতবর্ষের যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়, তেমনই ওর কপালে মোটা হওয়া নেই।—কথায় ছেদ পড়ে—উজ্জ্বল গলার সুর এক পর্দা তুলে অসম্ভব কৌতুকের স্বরে চিৎকার করে ওঠে।

—দ্যাখ—শোন সবাই। একটা দারুণ খেলা মাথায় এসেছে। খেলা, যাক্ কি বল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ-সমস্বরে উত্তর যোগান আসে।

—কি—কি খেলা? অনির্বাণ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অবাক করে দিয়ে প্রশ্ন করে।

—এই যে এসেছিস। যাক ভালই হল। আমাদের আড্ডার কম্পোনেন্ট ফিল্ আপ হচ্ছিল না তোর জন্য—উজ্জ্বল এক অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় বলে।

—খেলাটার দুটো শর্ত আছে ; এক আমরা কেউ অসৎ হব না। দুই ; আমরা যথেষ্ট সাহসী হব।—কী রাজি ?

—খুব খুব অনির্বাণ হিমাংশু ইন্দ্রাণী-কমলেশ আনন্দে হৈ চৈ করে ওঠে।

উজ্জ্বল একটা সিগারেট ধরিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করে—সবাই স্ট্রেঞ্জ।

কেন স্ট্রেঞ্জ এর কি হল ? সবাই যখন আছি, সবায়ই পার্টিসিপেট করব ; এটাই তো স্বাভাবিক।

—নাকি তোর খেলা বুঝবে না কেউ কেউ। তুই কি এখনও সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স এ ভুগিস। সেই কলেজ দিনের মত ? অনির্বাণ ব্যঙ্গ করে।

এ রকম প্রশ্নের জন্য বোধ হয় কেউই প্রস্তুত ছিল না। উজ্জ্বল সম্পূর্ণ ব্যঙ্গটাকে উপেক্ষা করে নির্লিপ্ত মুখে বলতে শুরু করে—আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা অস্তিত্ব আছে, হুইচ ইজ নট এক্সপোজড ইভন টু আওয়ার সেলভস্। রাইট !

—ইন্টেরেস্টিং—হিমাংশু বলে। তারপর ?

—হ্যাঁ এখন আমাদের এই অস্তিত্বটা আমরা যখন নির্বান্ধব সংগী হীন বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকি আমাদের সংগ দেয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু হবার-পাবার প্রবল বাসনা আত্মগোপন করে থাকে পরিতৃপ্তির পরেও। আমরা হখন কলেজ লাইফ কাটিয়েছি তখনতো অনেকের অনেক রকম অতৃপ্তি বোধ কাজ করত এ আমি দেখেছি। ধর সেটা প্রায় বছর পাঁচ ছয় এর আগের কথা ! এখন আমরা সেই সমস্ত অনুভূতি বাসনা কামনার কতটুকু স্পর্শ করতে পেরেছি তা কেবল আমরা স্বতন্ত্র নিজস্বভাবে জানি। কেননা আমরা প্রত্যেকেই এখন মোটামুটি এস্টাব্লিশড্। আজ আমরা সেই সমস্ত গোপনীয় অপরাধমুখী প্রবণতা পরিতৃপ্তির বাসনার গল্প। ইন্দ্রানী বলে ওঠে ; অনির্বাণ ঠিক বুঝলাম না। আরেকটু ক্লিয়ার কর।

ওঃ কে ধর আমরা প্রত্যেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আরেকটা জীবন অতিবাহিত করি। ঠিক আছে—

তার পরিসীমা সম্পর্কে আমাদের কোন সচেতন জ্ঞান নেই। গোটা ব্যাপারটা ভীষণভাবে অন্তর্মুখী। জীবন প্রবাহের উল্টো মুখে বয়ে যাওয়া স্রোত। সে আমাদের আকর্ষণ করে, আমরা তাকে ভালবাসি সব গোপনে। অর্থাৎ এ একটা জীবনের মধ্যেই নিহিত জীবনের উল্টো পিঠ। আমরা দেখি না। যেমন দেখি না, আমরা আমাদের ঘুমন্ত রূপটাকে।



—বুঝতে পেরেছি।

ঠিক আছে তাহলে সবাই রাজী। মাইল্ড দ্যাট আমরা সংভাবে অপেশাদারী স্বীকারোক্তি দেব নিজেদের নিজেরাই !

—উজ্জ্বল কথা শেষ করে। গোটা ঘরে অদ্ভুত নীরবতা। তবু খেলাটা সবাইকে নাড়া দিয়ে যায়। ইন্দ্রাণী—অনিন্দিতা আরক্তিম মুখে চশমা খুলে ঘাম মুছল। একমাত্র উজ্জ্বল ছাড়া সবাই গম্ভীর।

কি ব্যাপার শুরু কর - তোরা কেউ একজন—উজ্জ্বল তাড়া দেয়।

অনির্বাণ বলে ওঠে ঃ আমার আপত্তি আছে।

—ও কে

—তুই স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারিস।

—ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, উজ্জ্বল এ খেলাটা আত্মহত্যার সামিল। আমি নিজেকে বড় ভালবাসি রে। আমি খেলছি না। হিমাংশু বলল।

ঠিক আছে আর কেউ ? আর কারও আপত্তি আছে ! তাহলে আমি, মৃগাঙ্ক, ইন্দ্রাণী, মণীন্দ্র, অনিন্দিতা খেলছি। পাঁচজন।

—আমি বাদ। খানিক ইতস্ততঃ করে মণীন্দ্র বলে।

আর কেউ ? মুচকি হেসে উজ্জ্বল প্রশ্ন করে।

ঠিক আছে লেটস স্টার্স, তবে হ্যাঁ হিমাংশু, মণীন্দ্র এবং অনির্বাণ একটা অনুরোধ করছি তোরাতো পার্টিসিপেট করছিস না, তোদের ঘরের মধ্যে থাকা চলবে না। আই মীন পেরিফেরীর মধ্যে। অনির্বাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় উজ্জ্বল বলে তাহলে অনির্বাণ, আমার সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ ভোগবার যথেষ্ট কারণ আছে ; কি বলিস !

অসম্ভব আক্রোশ ফুটে ওঠে অনির্বাণের মুখে। যেমনটা ফুটে উঠত বহু বহু দিন পূর্বে কলেজ জীবনের বিবিধ সংস্পর্শে ! ওরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এক মিনিট—। কমলেশ ইন্দ্রাণী তোরা এখন স্বামী-স্ত্রী। সামাজিকতার প্রশ্ন আছে। তবে আমাদের এটা খেলাই। নো মোর দ্যান দ্যাট। এই ঘর চৌখাট পেরোলেই আমরা সব ভুলে যাবো। ওঃ আরেকটা কথা, যে যখন কথা বলবে, অন্যেরা চোখ বন্ধ করে থাকবে। বেঁধেও থাকতে পারে—ইচ্ছা করলে। ঠিক আছে। হ্যাঁ তবে শুরু করা যাক। কে প্রথমে বলবি ! আমি বলতে পারি।

আমি শুরু করছি ইন্দ্রাণী বলল।

ঠিক আছে আমরা চোখ বন্ধ করে আছি।

—আঁচল দিয়ে গোটা মুখটা মুছে নিয়ে চশমাটা খুলে টেবিলের উপরে রাখে। একবার কমলেশের দিকে তাকায়। আঁচলটা কোলের উপর টেনে নেয়।

আমার সঙ্গে তোদের পরিচয়, আমি যখন কলকাতায় এসে কলেজে ভর্ত্তি হলাম তখন থেকে। কমলেশও তখন বাইরে থেকে এসে কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে। যাক সে সব কথা। 'আমি ছোটবেলা থেকেই আমার দিদির দারুণ ভক্ত ছিলাম। আমরা সহদরা ছিলাম না। আমার মায়ের দুটো বিয়ে। দিদি মায়ের প্রথম সন্তান। ছোট থেকেই বুঝতাম, দিদি আমাকে অসম্ভব ভালবাসে। দিদির মনটা কুসুমের মত, কখনো কোনো ডিফান্ করিনি ; বাবা-মাও শিক্ষা দেন নি সে রকম। তবুও আপন হিংস্র প্রবৃত্তিগুলো আমার মধ্যে বিনা পরিচর্যাটাতেই অজান্তে বেড়ে উঠল। আরেকটু বড় হলে মেয়েদের রূপ সম্পর্কে সচেতন হলাম। দিদি আমার থেকে বুদ্ধিমতী সুন্দরী অহরোহ এ রকম প্রশংসা সূচক বাক্যে আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগলো। এমন অবস্থা হল নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিলাম না। আমার বাবা এবং মায়ের মধ্যে অসম্ভব বোঝাপড়া ছিল। দুজনেই ছিলেন ধৈর্যশীল সহনশীলতায় আধুনিক, উদার। আমি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি, এমন সময় একদিন বাবা এবং মা ওঁদের পূর্ব জীবনের সমস্ত কথা খুলে বল্লেন। আমার পুঞ্জীভূত বিদ্বেষে যেন অগ্নিসংযোজন হল।

আমি ছোট থেকে দারুণ জেদী, একরোখা গোছের। কাউকে না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। তখন আমি নাইনে পড়ি। কোথায় যাব, কিছু ঠিক নেই। পৌঁছে গেলাম বোম্বাইতে। ততদিনে দিন সাতেক কেটে গেছে। প্রথমে ছিলাম এক বন্ধুর বাড়ী। বন্ধুর এক মাসতুতো দাদা থাকতেন ওদের বাড়ী। জায়গাটার নাম চম্পা। বিলাসপুর থেকে কিছু দূরে। আমি সেই ছেলেটির প্রেমে পড়লাম যথারীতি। এর মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম। সেতো গেল। একদিন রাত্রিবেলা সুজয়দা ( আমার বন্ধুর সেই দাদার নাম ) অসম্ভব ড্রিংক করে ফিরছে। আর একটা কথা, গীতাঞ্জলীর বাবা মা থাকতেন উত্তর প্রদেশে, গীতাঞ্জলী একটা ইংরিজী মিডিয়াম স্কুলে পড়ত বলে উত্তর প্রদেশে থাকত না। সুজয়দার কোয়াটারে। সেই রাত্রে আই লস্ট মাই ভার্জিনিটী। গীতাঞ্জলী বাড়ী ছিল না। স্কুল থেকে ট্যুর-এ গেছে। যখন আমার খেয়াল হল আমি কি করে ফেলেছি তখন আর কিছু করার নেই। আমার বুকের মধ্যে হুহু করে উঠল। বাবা-মা দিদির জন্য। আমি গীতাঞ্জলীদের বাড়ী ছাদে বসে ভীষণ কাঁদছি। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন।



সেই রাত্রেই একটা আবির্টারি ট্রেনে উঠে বসলাম। আমার তখন মাথার
ঠিক নেই। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে .. বাড়ী আমি কিছুতেই ফিরে
যেতে পারব না। এমন কি বাড়ীর কি অবস্থা ভাবতেই আমার সাহস হচ্ছে না
তখন। সে প্রায় একমাস হয়ে গেছে। তারপর আমি নিজেই জানিনা কি করে
কি হ'ল। বাড়ী ফিরলাম। বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম দিদি মারা গেছে
শুনে। বাবা মা শোকে পাথর। আমি ফিরে যেতেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার কান্নায় ভেঙে
পড়লেন। বাবা মা আমাকে একটিও প্রশ্ন করলেন না। আত্মধিক্কারে আমি
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি যেন ক্রমশ।...আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।
পুরুষ সম্বন্ধে অসম্ভব সচেতন ঘৃণা মনের মধ্যে জন্ম নিল। কলকাতা
এক অন্য জগৎ। ছেলেগুলোকে একেকটা যৌনতার প্রতিষ্ঠান মনে হত। আমার
কিছু করার ছিল না। তীব্র ঘৃণায় আমি মাঝে মাঝে আমার হাতে জ্বলন্ত
ধূপকাঠি চেপে ধরতাম।

জীবনে কাউকে বলিনি। বাবা মাও জানতেন না। কমলেশ জানল না।
আমার গুটি পোকার মত আত্মকেন্দ্র ও কেমন করে ছিঁড়ে ফেলল। আমি নিজেই
জানিনা কিন্তু ওর লৌহস্তম্ভের মত ভালবাসার আলিঙ্গনে আমার স্বাতন্ত্র
সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়ে গেল কমলেশের মধ্যে।

আঁধারে তবু আজও মাকে মাঝে ওর পাশে অভুত বিছানায় শুয়ে থাকতে
আমার কোন কোন দিন মনে হয় ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই। যেমন সুজয়দাকে
দিয়েছিলাম।

...আমি ওর দেহে হাত রাখি, আমাক আঙ্গুল কাঁপে অদ্ভুত হিংস্রতায়।
কমলেশ ভাবে আমি ওকে মৈথুনে আহ্বান করেছি।...

ইন্দ্রাণী আর বলতে পারেনা কান্নায় মোমের মত গলে যেতে থাকে। ঘরের
সেই স্থবিরতায় ইন্দ্রাণীর কান্নার শব্দ তীর হয়ে বিঁধে থাকে।

সাবাস !—ফ্যান্টাসটিক। চোখের বাঁধন খুলতে খুলতে সবাই বলে ওঠে।

—'তাহলে এবার কে বলবে ?—উজ্জ্বল প্রশ্ন করে। এদিক ওদিক তাকায়।
আমি বলব ? ঠিক আছে। শুরু করছি।

আমাকে তোরা সবাই জানিস, চিনিস ভালবাসিস ? কে জানে। তবে
তোরা আমার সম্বন্ধে যা যা বলিস তা হ'ল উজ্জ্বল অসম্ভব বুদ্ধিমান –
উজ্জল খুব 'বিনাইন', উজ্জ্বল থাকলে খুব এনজয় করা যায়। আমি তোদের
আরেকটু ধারণা পরিস্কার করে দিচ্ছি—আমরা এক একজন এক এক রকম।
এই রকমটা আমাদের স্বতন্ত্র। জানিস্—আমার মধ্যে অদ্ভুত দুটো স্বত্তা
কাজ করে। বিপরীত মুখী। মাঝে মাঝে এদের টানা পোড়েনে আমি পাগল

হয়ে যাই। ভূমিকা করছি না। আমি অত্যন্ত অর্থলোভী। সে তোরা চিন্তায় আনতে পারবি না। আমি তোদের আমার অর্থ লিপ্সার কিছু উদাহরণ দিই। না হলে বুঝতে পারবি না। আমার জ্যাঠামশাই ভীষণ ভাল চাকুরী করতেন। একদিন, হঠাৎ খবর পেলাম জ্যাঠামশাইয়ের গাড়ী অ্যাক্সিডেন্ড করেছে। আমি তখন বাড়ীতে একা। গেলাম হাসপাতালে। তখনও কেউ আসেনি। একজন আমাকে বিভিন্ন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে একটা ফর্ম ফিলাপ করতে দিল। সেই সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের ঘাড়, মানি ব্যাগের মধ্য অজস্র টাকা দিয়ে বলল এগুলো পেসেণ্টের কাছে ছিল। আমি নির্দ্বিধায় পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। বাড়ীতে ফেরৎ দিলাম না কিছুই। এরপর শ্রাদ্ধ শান্তির সুযোগে আলমারীর চাবি নকল করে কিছু গয়নাপত্র আরও কিছু টাকা সরালাম।

আমি তখন অনার্স পড়ি। বিভিন্ন বন্ধুদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে আসি পড়ব বলে। তারপর সেগুলো বিক্রি করে দিতাম। বলতাম হারিয়ে গেছে। এতো গেল একটা দিক। আমার সব সময় কি মনে হয় জানিস— আমাকে সবাই সন্দেহ করছে। আমার কারোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না। আমার কাউকে ভাল লাগে না। আই মীন আমি কাউকে ভালবাসতে পারি না। লোকে বলে বটে উজ্জ্বল একটা অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। কিন্তু সে ভড়ং। বিশ্বাস কর মানুষ যখন প্রশংসা করে তাতে খাদ থাকে, কিন্তু নিন্দেটা হয় আন্তরিক। আমার সব কিছু নকল। আমার মধ্যে ভাল বলে কিছু নেই।

এই যে আমি এখন তোদের সঙ্গে মিশে আছি, আমার মধ্যে এক স্বার্থপর হিংস্রতা কাজ করছে। কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ব।

উজ্জ্বল আচমকা থেমে যায়। আমার বক্তব্য শেষ। এবার তোরা কেউ বল। উজ্জ্বল কথাটা শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অন্যান্যরা চোখের বাধন খুলে ফ্যালে।

'এবার আমি বলছি।' বলে কমেলেশ শুরু করে। আমাদের ছোটবেলায় ছিল যৌথ পরিবার। সবাই একসংগে খুব হৈ চৈ করে দিন কাটাতাম। আমারই সমবয়সী আরও অনেক ভাইবোন ছিল। সবাই সুস্থ দেহে মনে একসঙ্গে বেড়ে কিন্তু ওদের মধ্যে থেকেই আমি কেমন করে প্রবঞ্চক হয়ে উঠলাম, কে জানে?

আমার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, জানিস্—সেটা হ'ল অস্থিরতা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াশ সব সময়। আমাকে মুহূর্তমাত্র স্থির থাকতে দেয়না। আমার বন্ধু বান্ধব, মা বাবা কাউকে ভাল লাগেনা। আমার পরিচিত মুখ দেখলে মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়। অবিশ্বাস্য এক ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি কাজ করে আমার মধ্যে। মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীকেও অসহ্য লাগে। ইচ্ছে করে দূরে বহুদূরে পালিয়ে যাই।



আমার মধ্যে এক পলায়নী মনোবৃত্তি কাজ করে। আমার বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে ক্রেজী বলে। আমার কি মনে হয় জানিস—দ্য ওয়ার্ল্ড শোজ আস আওয়ার ওন ইমেজ—অ্যাস ওয়েসিস অব হরর ইন এ ডেজার্ট অব স্টেডিয়াম। আমার ভাল্লাগে না। আমি সবচেয়ে বেশী অস্বস্তি বোধ করি নিজেকে নিয়ে। অস্তিত্ব বাদের উৎস কি আমি জানি না। আমি কোন এক সমস্যায় এসে পড়েছি। অ্যাম আই নট আ ডিজনেন্ট কর্ড ইন দা ডিজাইন দি মুনি?

আমি সংসারী- তোরা তাই মনে করিস। কিন্তু বিশ্বাস কর; ইন্দ্রাণী, আমার স্ত্রীকেও আমি এ সব বোঝাতে পারব না। শব্দ আর কতটুকু? আমার এ অস্বস্তি আমি শব্দের মাধ্যমে তোদের কাছে পৌছে দিতে পারবো না। আমার মনে হয় যেন কেমন আত্মপ্রতারণায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। শৈশব কত সুখের বল্‌তো? যে সময় ব্যক্তিসত্বা কখনো বিক্ষুব্ধ হয় না রে। হৃদয়ে এখন আমার সুখের প্রশান্ত সহাবস্থান নেই। ক্রমশঃ অসত্যের যবনিকার আড়ালে নষ্ট হয়ে যাই।

আমার মধ্যে ব্যাপ্তি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এ আত্মকেন্দ্রাতিগ অনুভূতি আমার ভাল লাগছে না। স্বার্থান্বেষী; স্থূল বস্তুতান্ত্রিক অভিরুচিতে আমার হৃদ্‌পিণ্ড পূর্ণ হয়ে উঠছে। আমার মনে হয় আমি বোধ হয় জীবনের সূত্রপাত বড়ভুল পথে করে ফেলেছি। বুকের মধ্যে আজ আর আদর্শ বলে কিছুই নেই। নিজেকে অসম্ভব বিক্ষিপ্ত লাগে।

আমার মাথার মধ্যেটা সমুদ্র হয়ে উঠছে। কোথা থেকে জানিনা প্রবল জোয়ারে অজস্র কীট ভেসে আসছে। আমার মাথার ভিতরের স্বাদু অঞ্চলগুলো কুরে কুরে খাচ্ছে। ফেনা, বালি, মাছের আঁশের আদিম গন্ধ। বিজবিজ শব্দে ফেনাগুলো মরে যাচ্ছে। উফ্‌ অসহ্য!

জানিস, একেক রাত্তিরে আমার ঘুম আসে না! কোন দুশ্চিন্তা নয়, এমনি। অবসাদে স্নায়ু ছিঁড়ে টুকড়ো টুকড়ো হয়ে যায়। চোখ জ্বালা করে, উত্তপ্ত শ্বাস, গভীর অন্ধকার করাতের মত কাটতে থাকে। ইন্দ্রাণী পরম নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

আমি ওর ঘুমন্ত মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে থাকি। ও স্বপ্ন দ্যাখে, বিড়বিড় করে। সন্তান সুখ, উষ্ণ আশ্রয় ওর মধ্যে গভীর স্বাদ এনে দিচ্ছে বুঝতে পারি। আমার মুঠির মধ্যে ডি, সি, এম র সদৃশ চাদর, চাদরের উপরে ছাপা কোনারকের সূর্য মন্দিরের চাকা, প্রবল চাপে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। আমি আমি বুঝি না রে, বিশ্বাস কর আগে বল্লাম না এক অদ্ভুত অস্থিরতা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। উজ্জ্বলের মতই কিনা বুঝি না— দ্বিধা বিভক্ত স্বত্তা আমি তার স্পষ্ট উপস্থিতি টের পাই।

জানিস আমার ভীষণ ইচ্ছা করে আমি সংঘ ভালবাসব সার্বজনীন হয়ে বেঁচে থাকব কিন্তু কৈ পারছি। আমি যদি কবি শিল্পী সাহিত্যিক হতাম উপযুক্ত শব্দ নির্বাচনে হয়ত বা আমার এই বিপন্নতা প্রকাশ করলেও করতে পারতাম, আমি তাও পারি না।

লবণের স্বাদ আমরা সবাই জানি. সবাই উপলব্ধি করি. কিন্তু স্বাদটা বর্ণনা করতে পারবি কি তোরা কেউ ?

আস্তে আস্তে প্রত্যেকে বাঁধন খুলে ফ্যালে। কেবলমাত্র অনিন্দিতা বাকি থাকে। মৃতেরা যে কবরে সারিবদ্ধ হয়ে শুয়ে থাকে তার স্বাদ কিরকম। সেই বিজন ভূমির উপরে যে সমস্ত বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের জিজ্ঞাসা করে কোন লাভ নেই।

হিমাংশুর ঘরে. আজ যারা সম্মিলিত তারা জীবন্ত মৃতদেহ। পরস্পরে কী ভাষায় কথা বলে নিজেরা বোঝে না।

যেন দূরে থেকে অনিন্দিতার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

আমি মেয়ে হিসেবে সুন্দরী। যথেষ্ট রূপসী দেখতে আমাকে, আমি জানি। এবং আমি খুব অহংকারী। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয় জানিস। এত সাধারণ নয়। যাদের কুৎসিত দেখতে আমি তাদের সহ্য করতে পারি না। আমি যদি কখনও নোপোলিয়ন কিংবা হিটলারের মতন একনায়কতন্ত্র সর্বময় কর্তৃত্ব পাই আমার রাজত্বে তারা কেউ বেঁচে থাকবে না।

এই যে কমলেশ, উজ্জ্বল তোদের আমার কি মনে হয় জানিস্। তোরা আমার সঙ্গ পাবার জন্য লালায়িত। 'লালায়িত' এই শব্দটাই ব্যবহার করলাম। আমার মধ্যে অনিবার্য যৌন আকর্ষণ আছে। যা তোদের আকৃষ্ট করে, শুধু তোদের কেন, কলেজেও দেখেছি—শ্রাবন মাসে স্ত্রী কুকুরের যৌন সংসর্গ পাবার তীব্র বাসনায় পুরুষ কুকুরগুলো যেমন ঘুরে বেড়ায়, অনেকের মধ্যে সেই তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে কত বিভিন্ন সময়ে।

আমার ভালোলাগে পুরুষগুলোকে নাস্তানাবুদ করতে। এ বিষয়ে আমার পরিতৃপ্তির সীমা নেই। তোদের মনে আছে কিনা জানিনা, আমাদের সঙ্গে পড়ত চন্দ্রশেখর। ওর কথা ভাবলেও আমার গা জ্বলে যায়। একদিন কাব্য করে আমাকে বলল, অনিন্দিতা আমি তোর প্রেমে পড়েছি। মনে হচ্ছে এই অনুভূতি জগতে আমারই প্রথম হল।

সেদিন চন্দ্রশেখরের প্রচুর ঘাড় ভেঙে ছিলাম। ওকে মনে মনে আমি আমার হাবসী খোজা বলতাম। ওর মত নির্জীব পুরুষ একটাও দেখিনি। ওকে যদি কখনও মুখ ফুটে বলতাম, দ্যাখ চন্দ্রশেখর আরও অনেকে আমার প্রেমে পড়েছে তুই বরং ভাল কারিগড় দিয়ে আমার একটা মাটির মূর্তি গড়িয়ে। হ্যাঃ হ্যাঃ। বেচারী ওতেই রাজী হত।



তবে জানিস চন্দ্রশেখর একটা ব্যাপারে আমাকে দারুণ নাড়া দিয়ে গেছে। সেই রকম কথা কখনও তোদের মধ্যে শুনিনি। ও একটা চিঠি দিয়েছিল আমাকে, তার প্রতিটা বাক্য আজও আমার মনে আছে ঃ

'আমি তোমাকে ভালবাসি, অনিন্দিতা -একথা আমি তোমাকে কখনই বলি না। ওটা হয়ত বা কারো কারো বিশ্বাসের উৎস, আমার অত্যন্ত নির্বোধের মত লাগে। 'আমি' শব্দটাই অবিশ্বাসী। ভালবাসা কারো কারো ক্ষেত্রে ঈশ্বরীয় প্রতিমূর্তি, আমি সচেতনভাবে প্রতি মুহূর্তে সেই ঈশ্বরকে ধ্বংস করে ফেলি। আমি সম্পূর্ণ নাস্তিক। গুটিকয় শব্দকে ঘিরে যে বাক্যটা এই চিঠিটায় প্রকাশিত, আমি তাদের ঘৃণা করি। অন্ততঃ এই বিন্যাসকে।

কখনও বিবাহোৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছো ? হয়েছো নিশ্চয়। লম্বা সারিতে খেতে খেতে একটা গন্ধ পাওনি, মাংসের ঝোলের, মাছের। বহু ব্যবহৃত ত্রিপল বাঁশ দড়ি বাসনপত্র চেয়ার টেবিল ? কী অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধ, তোমার অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝবে না। আমার বমি উঠে আসে। গোটা উৎসবটাই কেমন হাস্যকর লাগে। বিবাহিত স্বামী স্ত্রী পরস্পর প্রতারিতের মতন বসে আছে ! গোটা ঘটনাটাই অতীত, তবু কেন এখনও এই ঘটনার স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে আছি ? সেটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

এটা মানবেই মানুষ সে যতই নির্বোধ ব্যক্তিত্বহীন হোক না কেন, তবুও সামাজিক, পারিবারিক লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা স্বাতন্ত্র কাজ করে। নিজের প্রতি একটা জ্যোতিষ্কের মতন মোহময় উৎস প্রত্যেকের মধ্যে আছে। আমার তোমার সবার মধ্যেই সর্বক্ষণ। আমি ক্ষনিকের জন্য সে উৎস সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিলাম।

এমন সময় গেছে, যখন আমি এখনকার হিসেবে নিজেকে পাগল বলি। একটা মানুষ কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না। কোথায় যেমন খাদ মিশাবার প্রয়োজন থাকে, গয়না গড়ার খাতিরে তেমনই চরিত্রের কোন কোন অঙ্গলে পাঁচ মিশেলা অস্তিত্ব থাকার দরকার। ভারসাম্য থাকে না। ব্যক্তি অস্তিত্ব মহাজাগতিক সংঘর্ষে মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা কেউ থাকবই না।

কিন্তু তোমাকে আমার পরিপূর্ণ মনে হত। আমাদের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র মানুষী প্রজাতি মনে হত তোমাকে। বিশ্বাস কর এতটুকু অনুরঞ্জিত ঘটনা নয়। তবে আমার ভাগ্য আমাকে বেশী দিন পীড়িত হতে হয়নি। আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো, অসৎ হতে পারো। কিন্তু কেন বলতো ? তুমি তো সাধারণ বই আর কিছুই নয়, কাজে বুঝতেই কত বেশী ইর‍্যাশিওন্যালিটি কাজ করত আমার মধ্যে !

আমি ভাবতে পারি না যে আমি আমার পছন্দমত একটি এবং একটিমাত্র

চরিত্র নির্বাচন করে তার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলব, আহলাদিত বোধ করব। এ আমার কীটের মত লাগে। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি পর্যটনে বিশ্বাসী। কাজেই তোমার প্রতি আমার মন্ত্রমুগ্ধতাকে ঘৃণা করি এবং শ্রদ্ধা করি তোমার অস্তিত্বকে।'

এই পর্যন্ত বলে অনিন্দিতা থামে শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করে—চন্দ্রশেখরের চিঠিটা এখানেই শেষ। চিঠিটার এমন একটা কিছু ছিল যা আমাকে আজও চুম্বকের মতন আকর্ষণ করে।

আমার অসম্ভব উন্নাসিকতা আছে। আমিকাউকে বিয়ে করতে পারব না।

স্নান ঘরের সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে আমার বিবর্ণ স্তন, অজন্তার গুহা চিত্রের মত জঙ্ঘা লুপ্ত ঘ্রাণ নাভি দেখে আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠি। দর্পনের দিকে তাকাতে পারি না। আমার শ্বাস রোধ হয়ে আসে। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ও বহুদিনের সঞ্চিত অর্থের মতন অনিন্দিতার অশ্রু হিমাংশুর ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেন মনে হয়, অনিন্দিতা এক রূপ যক্ষ। চূর্ণ চূর্ণ হয়ে শোকের এক বর্ণহীন স্রোত ওর আঁচল ভিজিয়ে দিচ্ছে।

এ আমরা কি করলাম। উজ্জ্বল। এ আমরা কি করলাম। তোর কথা শুনে ?

অনিন্দিতার হৃদয় নিংড়ে উঠে আসা কথা গুলো ইন্দ্রাণী, কমলেশ, উজ্জলকে কাঁদিয়ে দিয়ে যায়।

এমন এক নির্জনতায় ওরা নির্বাসিত হয় যা অপার্থিব। এখানে সত্যিই কেউ পৌঁছতে পারে না। আবার যারা সেখানকার বাসিন্দা এ সভ্যতায় তাদের দেখা মিলবে না।



# ক্লাসিক নিয়ে দু-চার কথা

## তরুণ সান্যাল

শিল্পের সঙ্গে সব মানুষেরই সম্পর্ক কোন না কোন ভাবে রয়েই যায়। তবে অনুভবের সচেতনতার ব্যাপারে বেগকম হতেই পরে। ভাষাই হোক আর নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীই হোক, মানুষকে সে সব গড়ে নিতে হয়, স্বাভাবিক প্রকৃতিসম্ভুত নয়। আর নয় বলেই, মানুষ নিজের চাহিদা মাফিক, প্রয়োজন মাফিক কাম্য উপকরণগুলিকে এমন ভাবে ব্যবহার করে যাতে সব চেয়ে বেশি আগ্রহ মেটানো যায়। যেমনটি চাই, তেমনটিই যেন গড়ে তোলা যায়। ভাষাওতো মানুষেরই গড়া সেই সিগন্যালই, যা দিয়ে বড় মাপের চাওয়াটি যেন ছোট্ট উচ্চারণে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব।

পাভলব বলেছিলেন মানুষের ইন্দ্রিয়ে বাইরের জগতের ইঙ্গিতগুলি পৌঁছচ্ছে। অন্য জীবের মতোই মানুষ বাইরের প্রপঞ্চ বিষয়ে তাই বোধহয় গড়ে তুলতে পারে। সেটি হলো প্রথম সিগন্যালিং। মানুষের সৃষ্ট ভাষা হলো দ্বিতীয় সিগন্যালিং— যে ইঙ্গিত দিয়ে মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানকে মিলিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভাব্যতাও তুলে ধরতে সক্ষম। আমরা কি তৃতীয় সিগন্যালিং বলবো শিল্প বা আর্টকে ? শিল্প আমাদের অনাবিষ্কৃত বিশ্ব আবিষ্কার করিয়ে দেয়। সে শিল্প ভাস্কর্যই হোক বা চিত্রকলাই হোক, নৃত্য বা সংগীত কিংবা শব্দভিত্তিক কবিতা বা কল্পনা মূলক শিল্প হোক। এমনকি বাস্তু বিদ্যার সঙ্গেও রয়েছে শিল্পের সম্পর্ক। ডোরিক বা গথিক, বারোক বা মাঞ্চু চৈনিক, এমন কি বাঙালি আটচালা—সব কিছুতেই রয়েছে প্রয়োজনটুকু মেটানোর পরেও সৌন্দর্যের ভিত্তি হিসাবে বিশেষ সুষম বিন্যাস। অলঙ্করণ বা গঠন সব কিছু মিলেই সেখানে শিল্পের দিকগুলি অঙ্গগত মিলছে। এখন আবার যন্ত্র শিল্পের জগতেও এমন কি একটি বিশেষ যন্ত্র গঠনের ব্যাপারেও, উপকরণ সংস্থাপনের বা আঙ্গিক বা খোলোসটি বানাবার মধ্যেও এসেছে নতুন ধরণের এক সৌন্দর্য। পণ্য এক একেকটির মোড়ক গঠনের মধ্যেও আছে সৌন্দর্যের ছাপ। একে আর্ট ইন ইনডাষ্ট্রি বলা হচ্ছে। অর্থাৎ শিল্পের জগৎ বেড়েই চলেছে। আবার নানান শিল্পমাধ্যমগুলির সংশ্লেষ বা সিনথেসিস ঘটবে চলচ্চিত্রে। এমন কি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি চলতি একাধিক শিল্পকে ঢের বেশি উপভোগ্য করছে।

যেমনটি দেখছি, বা ঘটছে বলে মনে হচ্ছে ঠিক তেমনটি অনুসরণ করেই কি শিল্প গড়ে ওঠে? যেমন ধরা যাক বাস্তুরচনার কথা। ঘরতো আসলে আদিম গুহারই বিকাশ। বাড়িঘর মন্দির মসজিদ গীর্জা এসবের সরল নকশার তো রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার কাজে স্বাভাবিক ভাবে পেয়ে যাওয়া মাথার ওপর আদিম আচ্ছাদন অর্থাৎ গাছপালা। যেমন, খেজুর গাছ মসজিদের গম্বুজে, পাইন উইলো চীনা জাপানী বাড়ির চালায়, বার্চ পাইন গথিক ক্যাথিড্রালে, এমনি আমাদের আম বটগাছ আটচালা চারচালায় বা গোড়ীয় মঠে বা মন্দিরের রত্নরচনায়! বাড়ি ঘর গড়ে তোলার কায়দা ও যুগে যুগে বদলেছে। সব সময়েই প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে, আরো একটি মাত্রা যোগ করার জন্য নিত্য নতুন ভাবে বাস্তুবিদ্যার নতুন তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ দেখা গেছে। এসেছে বাস্তু-বিদ্যাতেও নানান তত্ত্ব। নানান মাপজোক। নানান দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্যেও তেমনি কত নতুন নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে নানা সময়ে। বিলীনও হয়ে গেছে তেমন অনেক তত্ত্ব। তবে এখানে কয়েকটি মোটা দাগের তত্ত্ব নিয়ে নানান আলোচনা চলেছেই। এমন ধরণের তিনটি বিষয়কে আমরা ধরছি। যেমন ধ্রুপদী সাহিত্য, রিয়ালিস্ট সাহিত্য, রোমান্টিক সাহিত্য ইত্যাদি। অবশ্য ক্লাসিক শব্দটি বার করায় যে দিকের প্রতি আমরা ঝুঁকি, রিয়ালিস্ট বা রোমান্টিক শব্দ দুটির বেলায় তা নয়। কার্যত প্রথমটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে সাহিত্যের একটি অর্জিত ও নির্ধারিত অঞ্চলকে নির্দেশ করছি। বাকি দুটি কার্যত দৃষ্টিভঙ্গি, আন্দোলনও।

ক্লাসিক সাহিত্য বা ধ্রুপদী সাহিত্য বলতেই আমাদের চোখের ওপর ভাসে যেন আলমারি ঠাসা সোনার জলে নাম লেখা মোটা সোটা বাঁধানো বই। সে সব বই কদাচিৎই সাধারণ পাঠক তালাবন্ধ আলমারি থেকে বের করেন। ঐ সব বইপত্তরের লেখকেরা বেদীতে বসে পূজাই পেয়ে যাচ্ছেন যেন। নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে ওঠেন না সাধারণ পাঠকের। কথাটা ঠাট্টার মতো শোনালেও সত্যি। তাছাড়া পুরনো কোনো লেখক সর্বজন স্বীকৃত হয়ে উঠলে, তাঁর রচনা না-পড়েও পরের প্রজন্ম পরম্পরা তাঁদের অপঠিত রেখেও বাহবা দিয়েই যায়।

ঠাট্টা থাক। ক্লাসিক বলতে এলিয়ট বুঝেছিলেন, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত ভাষার ও বিকশিত সাহিত্যে পরিণাম মনের সাহিত্য সৃষ্টি। এমন ক্লাসিকে রচনা রীতিও একটি সাবলীল ও অর্জিত রূপ পেয়ে যায়। যেমন ভার্জিলের এনিয়াড। এধরণের ক্লাসিক সর্বকালীন সর্বজাতির উত্তরাধিকার। এবং তেমন ক্লাসিক হয়ে উঠতে না পারলেও কোনো ভাষার সাহিত্য বুঝতে হলে দরকার "maturity of mind, maturity of manners, maturity of language and perfection of the common style ভিত্তিক কোনো কোনো লেখকের রচনা।



এলিয়ট মনে করেছেন, ইউরোপীয় সাহিত্য তা যে কোনো ইউরোপীয় দেশেরই হোক না কেন, সেই সাহিত্যের শিকড় রয়েছে ভার্জিলে। আর ইংলণ্ডের আঠারো শতক সভ্যতার গুণাগুনে তেমন পরিণত না হলেও, ঐ mind, manners, language-এর maturity এবং common style-এর perfection ঘটেছিল পোপের কবিতায়। পোপ না বুঝলে, পরবর্তী ইংরাজী সাহিত্য ঠিক বোঝা যাবে না।

আমরা এমনি তুলনা দিতে পারি ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের সময়কার mature civilization-এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে। কালিদাসকে না বুঝলে ভারতীয় সাহিত্য বোঝাই বেশ কঠিন। তেমনি পোপের মতো সম্ভবত ভারতচন্দ্র—যাঁকে না বুঝলে ইংরেজ আগমনপূর্ব বঙ্গ সাহিত্য এবং ইংরেজ আসবার পরবর্তী বাংলা সাহিত্য ঠিক বোধগম্য হবার নয়। এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সহ রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁদের পরবর্তী বাংলা কবিতাকেও ধরা কঠিন।

ভারতচন্দ্রে নাগরিক বৈদগ্ধের সঙ্গে লৌকিক অভিব্যক্তি মিলেছিল সম্ভবত লৌকিক অভিব্যক্তির শিকড় চর্যাপদে ছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, বৈষ্ণবনীতি কবিতায় ও মঙ্গলকাব্যে। অন্যদিকে নাগরিক বৈদগ্ধ এসেছে কালিদাস তো বলেই, চৌরপঞ্চাশিকার ধারা বয়ে ফার্সী সুফি বোধকে সঙ্গী করে। অবশ্য অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী মাইকেলী ঘরানার কবিতাকে ক্লাসিক ধরে থাকেন। কেননা তাতে মিল্টনীয় পরিপূরকতার চিহ্ন মেলে এমন কি হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রও সেই ধরতাইতে বাদ পড়েন না। ক্লাসিক বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক আদর্শ চোখে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে মননে উত্তরাধিকারে—যার দর্পণে বা মান দণ্ডে পরবর্তীকালের দোলাচল মুখের অঙ্কিত সমাজ ও সময়ের সৃষ্টিকর্ম বিচার করা যায়। এতো কেবল সাহিত্যেই নয়। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে ও বাস্তুরচনায়, নৃত্যে অভিনয় ও সঙ্গীতে এমন কি জীবন চায়—একটা স্থিত সমাজে ঐসব বিষয়েরই ক্লাসিক আঙ্গিকের আদর্শ তুলনায় সামনে রাখা যেতে পারে।

সংগীতই প্রসঙ্গত ধরা যাক। ভারতের ধ্রুপদী ক্ল্যাসিকাল সংগীত যেমন এক বিশেষ সমাজোত্তর আদর্শ। বিশেষ পরিণত সভ্যতার সংগীতস্রষ্টার পরিণত মননের প্রকাশ রয়েছে তাতে।

বার্ষিক ও আহ্নিক গতির সময় ও নানান মনোভঙ্গির বা মুড এই সংগীতে যেমনটি ধরা হয়েছে, এখনো তা নতুন সংগীতস্রষ্টা ও শ্রোতাদের কাছে আদর্শ।

অবশ্যই ঐ ক্ল্যাসিকাল সংগীতের শিকড় লোকসংগীতের মধ্যে রয়েছে। একটি সুসভ্য সমাজে ঐ লোকসংগীতকে বিশেষ বিকশিত এক গুরুত্বপূর্ণ আকার ( significant form ) দেওয়া হয়েছে। আবার পরবর্তীকালে, বিশেষ বিশেষ সুরের একটি আদর্শ ধরা হয়েছে বিশেষ ঘরাণা। যেমন টপ্পার বা কীর্তনের, এবং ইত্যাদি। এবং ঐ ক্ল্যাসিকের পাশেই উপস্থাপনা ঘটবে রবীন্দ্র-সংগীত বা অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত বা দ্বিজেন্দ্রলাল। এঁরাও বিশেষ অবস্থায় ক্ল্যাসিকালত্ব অর্জন করেছেন—এবং এঁদের মধ্যে এক বিশেষ সাধারণ মিলও রয়েছে।

প্রথমটি হলো সময়োত্তীর্ণ ক্ল্যাসিকাল, পরিবর্তমান সময়ের ক্ল্যাসিকাল। গ্রেট ক্ল্যাসিকালের কাছাকাছি যা সেটি সময়কেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যেমন এঁরা অনেকেই তেমনটি হয়েছেন। এবং এঁদের আদর্শেই পরবর্তীকালের সংগীত তুলনা করে দেখা যায়। বলা বাহুল্য ক্ল্যাসিকালের মধ্যে তেমন অতি কল্পনার কিছু থাকেনা—বরং প্রকরণ আঙ্গিকে পরিণতির প্রকাশ থাকে। গ্রেট ক্ল্যাসিকালও অর্পিত আদর্শের ক্ল্যাসিকালের মধ্যে অবশ্যই তফাৎ থাকে। আর সেই আদর্শের নামে আইজেনষ্টাইন প্রভৃতি হয়ে পড়েন ক্ল্যাশিক ফিল্মের জনক। যদিও তাঁদের পরও তাঁদের ছাপিয়ে যাওয়ার মতো বহু চলচ্চিত্র পরিচালকের আবির্ভাব ঘটেছে।

ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে বলাবাহুল্য বাস্তবতার দিকটি থাকে বিপুলভাবে। তুলনায় রোমান্টিকতা কম। তবে গীতি কবিতায় রোমান্টিকতা থাকেই। রবীন্দ্রগীতিতেও সেই রোমান্টিকতা থাকলেও তার সুরেই ধরা পড়েছে নতুন ক্ল্যাসিসিজম। এবং সংগীত তো শেষ বিচারে সুরই।

কিন্তু শিল্পে বাস্তবতা প্রকৃতিবাদ ইত্যাদি বললেই বা কি বোঝায়, পরবর্তী কোন এক সংখ্যায় সে সব আলোচনা করা যাবে।



# নাট্য সমালোচনা

## নাটক—'কুকুর'

প্রযোজনা—এ্যাকটরস্ ইউনিয়ন

নিয়ন্ত্রণে—মলয় সেনগুপ্ত ও বিজন রায়

শিশির মঞ্চ—সন্ধ্যে সাতটা। অন্ধকারের প্রেক্ষাগৃহ, মাইক্রোফোনে লোকসংগীতের সুরে কাঠফাটা উত্তপ্ততায় বিপর্যস্ত জনজীবনের তীক্ষ্ণ আবেদন। পর্দা খুলে গেল। গ্রামজীবনের এক ব্যাপক রুক্ষতাকে অভিব্যক্তিতে ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় নৈপুন্যে দর্শকদের মুগ্ধ অথচ সজাগ করে যাবার প্রশংসনীয় প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে শেষ হল এ্যাক্টরস ইউনিয়ন প্রযোজিত 'কুকুর' নাটকটি।

নাটকের বক্তব্যের পটভূমি স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরে—আজকের ভারতবর্ষের গ্রামজীবন – যেখানে "প্যাঠ মেইর‍্যে থাকা মানিষ আর গোল মাচে কোন তপাৎ নি"—এই উপলব্ধিই কাজ করেছে নাট্যকারের এবং তারই ব্যঞ্জনাতে সাজানোও হয়েছে সমস্ত নাটকটি। নাট্যকারের এহেন উপলব্ধি যেমন নাট্য প্রযোজনায় উপস্থিত ছিল তেমনি বক্তব্য উপস্থাপনাতেও শিল্পরাজ্যে এক অসুন্দরের প্রতিচ্ছবির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সত্য উপস্থাপনাতেই শিল্প তার উদ্দেশ্য সাধনের রসদ খুঁজে পায়—সুন্দরের উপস্থাপনাতে নয়। 'কুকুর' নাটকটিতে দেখতে পাই সত্যের ব্যাপকতা, সুন্দরের রাজ্য ছেড়ে অসুন্দরের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেনি এবং অতি বাস্তব এক অসুন্দর জীবনে প্রযোজনায় তুলে ধরে শিল্প চর্চার এক সার্থক প্রচেষ্টায় রত হয়েছে প্রযোজক সংস্থাটি।

সমস্ত ঘটনাটি একটি গ্রামের চেহাড়ার আড়ালে দানা বেঁধেছে। একদিকে 'যুধিষ্ঠিরের' বাড়ি ও 'মানবের' চায়ের দোকানকে ঘিরে নাটকের গতি এগিয়ে গেছে ও পঞ্চায়েত প্রধান বিজত রায় কে কেন্দ্র করে কতগুলো আইনানুগ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে আরেক দিকে। ন্যাচ্রালিস্টিক নাটকের দৃষ্টিকোন থেকে গড়ে ওঠা প্রযোজনায় বিজতরায়ের বাড়ির ভিতর ও বাইরের তফাতে পর্দার ব্যবহার মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বেমানান মনে হয়েছে—যদিও

বিজন রায় তার মঞ্চ পরিকল্পনায় 'মানকে'র চায়ের দোকান ও যুধিষ্ঠিরের বাড়িটির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করেছেন।

অভিনয়ে সাবলীলতা বজায় রাখতে পেরেছেন—রিদে জাহেদ ও হরিণের চরিত্র চিত্রনে যথাক্রমে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন রায় ও নবকুমার দেব। সাবিত্রী চরিত্রে শ্রাবণী দাসগুপ্ত স্বাভাবিকতা ও মুভমেণ্টে যথার্থ সাবলীলতা দেখিয়েছেন। গ্রামীন ভাষাটিকে সামগ্রিক টিম ওয়ার্কের দিকে নজর রেখে আরও অনেক সাবলীল হতে হবে মানকে ও দামোদর চরিত্রে গৌতম গাঙ্গুলী ও শম্ভু দাস মিলকে—তারা গ্রামের কথা বলেছেন কিন্তু সংলাপে গ্রামীন চরিত্র হয়ে উঠতে পারেন নি—যদিও গৌতম গাঙ্গুলী চায়ের দোকানের মালিকের মেজাজটিকে ধরে রাখতে পেরেছেন। সংলাপ উচ্চারনে ও অভিনয়ে নৈপুন্য রাখতে পেরেছেন সীতু খুড়ো মলয় সেনগুপ্ত ও পঞ্চায়েত প্রধান বিজত রায় ঋষিকেশ দাশ—তবু ও এরই মধ্যে সংলাপ বলার দক্ষতায় অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায়—সাবলীল মুভেমেণ্টে সবাইকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে 'যুধিষ্ঠির' চরিত্রে অবনীশংকর দাস—এ কথা স্বীকারে কোনরকম দ্বিধার অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য নাটকের শুরুতে যে তীক্ষ্ণ আবেদন উপলব্ধি করা গেছে তার কারণ হিসাবে বলা যায় কণ্ঠসংগীত ও আবহসংগীতের একাত্মতার ফলশ্রুতি। কণ্ঠসংগীত ও আবহসংগীত যেখানে এক হতে পারে সেখানেই দর্শকের মনের উপর নাটক তার রসবস্তুকে সর্বাধিক রাখতে সমর্থ হয়। কাজেই নাটকের শেষে যখন দর্শককে শুরুর ঐ আর্ত আবেদনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হল তবে আবেদনের পুনর্তায় কণ্ঠসংগীত ও আবহসংগীতের প্রারম্ভিক ব্যবহারের পুনর্ব্যবহারে কৃপনতা দেখালেন কেন ?



# পূরবীর স্রোতে আলোড়িত রক্তকুমুদ

## উদয়কুমার চক্রবর্তী

কবিসত্তার পূর্ণ বিকাশের পথে নানা জটিল স্তর অতিক্রম করে। প্রজাপতির মতো এই অতিক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে 'পূরবী' পর্যায়ে। পূরবী-তেই ঘটেছে কবির পরিণামী অভিব্যক্তিবাদ ( Telcological Evolution)। রবীন্দ্রনাথের যাত্রা অনেকটা 'আলোর পানে প্রাণের চলা।' এটাই তাঁর কবিজীবনের মূলসত্য।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে পাই কবির সর্বোচ্চ উত্তরণ এবং 'পূরবী' পর্যায়ে এই প্রকৃতি, পূজা ও প্রেমের সমীকরণ ও জীবনরসের আস্বাদনের মধ্যে প্রবেশ করেছে অধোমুখী পরিবর্তন, বিপর্যয় ও বিষাদযোগের পালাবদল। 'পূরবী' তে তিনি মৃত্যু ও জীবনের সঙ্গে একটা রফা করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

"পূরবী"-র প্রথম সংস্করণে তিনটি পর্যায় ছিল—পূরবী ও সঞ্চিতা। এই সঞ্চিতা পর্বে একাদশটি কবিতা গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত পুরাতন পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি বর্জিত হয়েছে। এদের মধ্যে, 'শিবাজী উৎসব', 'নমস্কার', 'সুপ্রভাত'—সঞ্চয়িতায় সংকলিত। 'পত্র'-কবিতাটি 'প্রহাসিনী"র নতুন সংস্করণে প্রকাশিত এবং "দুর্দিন" কবিতাটি অন্য কোথাও মুদ্রিত হয় নি।

বর্তমান সংস্করণ "পূরবী"-র শেষ পর্যায়টিকে অর্থাৎ "পথিক" পর্যায়টি আমরা "পথিক" ও "প্রেমিক"—এই দু' ভাগে অনায়াসেই বিভক্ত করতে পারি। 'পথিক' পর্বে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পথিক সত্তা এবং প্রেমিক পর্বে বিধৃত হয়েছে তাঁর প্রেমিক মনোভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'এ গলিতে বাস মোর তবু আমি জন্ম রোমান্টিক—
আমি সেই পথের পথিক'

পথিকের চলা এবং জন্ম রোমান্টিকতা উভয়ই পূরবী গ্রন্থের এই শেষ পর্বে আমরা অনায়াসেই লক্ষ্য করব।

কবি পূরবী পর্যায়ে বাঁধা পড়েছেন, কিন্তু পথিক পর্যায়ে বাঁধা পড়েন নি। এখানেই তাঁর আলোর পানে চলা সার্থক হয়েছে। এই পর্যায়ে পথ নাটকীয় ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্যায়ে পথের প্রক্রিয়া ও পরিণতি সমার্থক।

ক. জানিনা কী মত্ততায়, কী আহ্বানে, আমার রাগিনী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে বিবাগিনী
লয়ে তার ডালি।

খ. ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী।'

এই পান্থের পরিচয়-ই কবির পরিচয়। এই যাত্রা নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়।' 'সোনার তরী' পর্বে যে আহ্বান কবির কাছে এসেছিল, তা থেকে এ পৃথক। এখানে কবি অভিপ্রায় বা মুক্তির সাধনা আছে। আত্মা—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত—এই চার লক্ষণের। কবি এই চারিটি লক্ষণের আত্মাকেই এখানে চাইছেন। তিনি বলেছেন,

'অনেক দূর দেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশী টানাটানি করতে হয়নি।...ঘাটের থেকে কিছুদূর গেলে ওই পিছুটানের বাঁধন খসে যায়। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে।'

পথিক পর্যায়ে এটাই কবির মূলকথা। 'সোনার তরী'তে অনিশ্চয়তার যাত্রা। 'খেয়া' 'বলাকা'র তরুণ পথিক দৈনন্দিন জীবনে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। তাদের মধ্যে চিরায়ত যাত্রা আছে। উত্তরজীবনে প্রবেশ করে কবি যেন নিজেকে ক্রমশঃই জড়িয়ে ফেলেন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে। তাই তিনি অবাধ মুক্তি চান। কবিজীবনের প্রতীক এই পথ—গতির কাজ করে তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

হয়তো বা আত্মবিস্মৃতির তমসা ঘনিয়ে উঠেছিলো কোথাও সহস্রের বন্যাস্রোত বা লুপ্তির কুয়াশা ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। খ্যাতি বিড়ম্বনা থেকে সরে এসে তাই তিনি 'অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে' আজ আলো জেলে নিতে চান।

বহির্ভূত এই তরুণ পথিক কাছে যাবেন? 'গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুয়ার সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও—এই হলো তাঁর উত্তর। সাগরপারে যে অপরিচিতা আছে অবগুণ্ঠন মোচন করবার জন্য কি কোন উৎকণ্ঠা নেই?—এই হলো তাঁর জিজ্ঞাসা। এ জন্য তিনি এসে পৌঁছলেন বুয়েন্স আইরেসে, 'পূরবী'র পথিক পর্যায়ের কবিতাগুলি লিখতে



লিখতে ১৯২৪ সালের ৬ই নভেম্বর। এই যেন তাঁর ফিরে আসা সন্ত থেকে কবির জীবনে। সাধনা থেকে প্রত্যাবর্তন পূরবীতে।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ ফিরে পান তাঁর মন্থর মুহূর্তগুলি—তাঁর অন্বিষ্ট অবকাশ নেই। তিনি বলেন,

ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ;
জন্ম মৃত্যু তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।

এইখানে আবার দিনে দিনে তাঁর সাজি ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে; হয়তো আরেক বিদেশী কবির মতো এইখানে এসে বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে পারবেন, আরেকবার—আবার ফিরে পেয়েছি তারে। কারে? শাশ্বতীরে।

'বলাকা'-য় এই যাত্রী অনাসক্ত, পূরবীতে নয়। 'পূরবী'তে আসক্তির কনকরেখা দেখা যায়। দোটানার টানা পোড়েনে কবির জীবনবাদ পরিবর্তিত হচ্ছে। পথিক সঠিক নয়; তাঁর অমীমাংসিত রূপ—সে কবি। মিল্টনের মতো রবীন্দ্রনাথ দেবতাদের কথা পৌঁছে দিচ্ছেন না মানুষের কাছে। ইন্দ্রিয়তার জন্য সহজ হতে চাইছেন তিনি। সতীর্থ নশ্বরদের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রিয় সংরক্ত লেখা তিনি পূরবী পর্বে লিখেছেন। পূরবীতে রক্তকুমুদ হয়ে উঠেছে প্রেমের কবিতাগুলি রক্তিম আবেগের গাঢ়তায়। আর এই রক্তকুমুদ তিনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আলোড়িত স্রোতের উপহার হিসেবে।

'ওগো মোর না পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ব বনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে।'১১

প্রেমিকের পর্যায়ের এই ভালোবাসা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোবাসা। এখানে প্রেম ও পূজার সমীকরণ হয়নি। ইয়েটসের উক্তি—

'Lovers while they aweit one another, shall find,
in murmuring them (the poems), this love of good
a magic gulf wherein their own more bitter
passion may bathe and renew its youth.'১২

'গীতাঞ্জলি পর্বে'র এই মিলন এই 'পূরবী' পর্যায়ে প্রাপ্য নয়। পূরবীতে পথিকের যে দুটি রূপ প্রকাশিত; তাকে বলা যায় কবিজীবনের

আরোহন এবং অবরোহন। প্রথমটিতে 'সাবিত্রী'র প্রতীক। ঋগ্বেদের ছায়া এতে থাকলেও, এ সূর্য ভারতীয় মাঙ্গলিক সূর্য নয়। সুকুমার সেন মনে করেন যে, কবিচিত্ত অসম্ভাবিতভাবে নতুন করে 'সাবিত্রী-দীক্ষা' লাভ করল। যে দীক্ষা কবি প্রথমে পেয়েছিলেন জন্মদিনের ব্রাহ্মমুহূর্তে। কিন্তু এ প্রাতঃ সাবিত্রী নয়, সন্ধ্যাসাবিত্রী। অতিবাস আরোহন নয়, নীরাজন-বিসর্জন।১৩

এ কথায় কবিজীবনের অন্তর্লীন বিষঙ্গতি ধরা পড়ে। কবি আসলে এখানে আধ্যাত্মিকতা খুঁজতে চেষ্টা করছেন ; পারছেন না। তিনি বলেছেন—

> 'হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাচ্ছন্ন, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতি স্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্ঘাটিত হোক।'১৪

রবীন্দ্রনাথ এই 'পূরবী'তে প্রকাশের আনন্দই চান। কারণ, 'The aim of art is delight'১৫। আর প্রকাশই হল অন্তরশায়ী সৌন্দর্যের আত্মপ্রকাশ। হয়তো বা কবির এই আকুতি বলা যায় এক মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে যাবার, এক space থেকে অন্য space এ যাবার যাত্রীসুলভ আকাঙ্ক্ষা তথা অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা। কবি সাদের মতোই তিনি, 'yet leaving have a name' ১৬ চলে যেতে চান।

বিদেশ যাত্রার মাধ্যমে তিনি বৃহৎযাত্রার প্রারম্ভিক ভূমিকা নিতে চান। তাই 'পূরবী'তে দেখা যায় এক নতুন অভিজ্ঞতার চয়ন।

> মনের মাঝে কে যায় ফিরে ফিরে—
> বাঁশীর সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি আলোটিরে।
> সাঁঝের হাওয়া করুণ হোক দিনের অবসানে
> পাড়ি দেবার গানে।'১৭

কবিজীবনে মৃত্যুর এই অভিজ্ঞতা আপাত নতুন নয় বলে মনে হয়। কিন্তু 'ভানুসিংহের ঠাকুরের কাহিনীতে (১৮৮৪) মৃত্যু ছিলো রহস্যময় তাকে জয় করাতেই ছিল তরুণ প্রাণের উচ্ছ্বাস। আশাও কম ছিল না। 'সোনারতরী'তে মৃত্যু প্রসঙ্গ এসেছে অবকাশ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে মৃত্যু-চেতনা পেয়েছে শান্ত সমাহিত রূপ।১৮ এই পর্বে কবি প্রধানতঃ সন্ত। কিন্তু এই প্রশান্ততার অবসান হল কবি চঞ্চল হলেন 'ছায়া ঘনাইছে দিকে দিকে।' তাই 'পূরবী'তে তিনি মৃত্যুর বিকীর্ণ শিল্প গড়ে তুললেন। বললেন,

> পূরবী সন্ধ্যাকালীন রাগিনী। সন্ধ্যাকালটি আমাদের মনে একটা বিদায়ের সুর সূচিত করে। ...পৃথিবীর সুরে সমাপ্তির এই বিদায় ব্যথাটিই মানুষের মনে অনুরণিত হয়ে ওঠে।১৯



## পিক্‌চার টিউব ব্যতিরেকে টেলিভিশন

ইউক্রাইন বিজ্ঞান আকাদেমির সেমিকণ্ডাক্টর ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞাণীরা এমন একটি টেলিভিশন সেট তৈরী করতে চলেছেন যাতে কোনো পিক্‌চার টিউবের প্রয়োজন হবে না। এই টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হচ্ছে অতিরিক্ত রকমের পাতলা একটি উদ্ভাসিত পর্দা দিয়ে। এই পর্দাটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। ছবির মান এমনকি সরাসরি সূর্যের আলোতেও কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। সাবেকী পিক্‌চার টিউব সমন্বিত টেলিভিশনে ফিল্‌ম-পর্দার ওপরে যে টান পড়ে, নতুন এই পর্দা এমনকি দেয়ালেও টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

## 'টিনে ভরা' জীবন

দক্ষিণ মেরু বা আন্‌টার্কটিকে আবিষ্কৃত ছত্রাক বরফের মধ্যে ১২,০০ বছর কাটিয়েছে। সোভিয়েত আনটার্কটিক স্টেশন 'ভোস্তক'-এর গবেষকরা বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতিক্ষুদ্র জীবাণু নিষ্কাশিত করেছেন। তারপরে সেই জীবাণু বপন করেছেন সারপুষ্ট একটি মাধ্যমে এবং সেই জীবাণুকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন।

জীবন্ত বস্তু হিমায়িক অবস্থায় কতকাল টিকে থাকতে পারে এবং বিরূপ অবস্থার মধ্যেও কতকাল প্রাণ-সহায়ক তৎপরতা বন্ধ রেখে চলতে পারে—তাই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনো উত্তপ্ত বিতর্ক চলছে। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তুলে রাখার পরেও ছত্রাক ৫০ বছর পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় থাকে (পরীক্ষাকার্যে এখনো পর্যন্ত দীর্ঘতম কাল)। আনটার্কটিকের ছত্রাক দেখে যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধারণা করা চলে, জীবন্ত সাইটোপ্লাজম সীমাহীন কাল বেঁচে থাকতে পারে।

## কৃষিতে আকুপাংচার

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির দূরপ্রাচ্য কেন্দ্রের গবেষকরা আকুপংচার ব্যবহার করে কয়েকটি মুরগি খামারে মুরগির ডিমকে বড়ো করে তুলেছেন। দু-লক্ষ মুরগিকে এই যন্ত্রণাহীন চিকিৎসায় রাখা হয়েছিল। তার ফলে এখন এই দলের প্রত্যেকটি মুরগি স্বাভাবিকের চেয়ে আরো ৩'২ গ্রাম বেশি ওজনের ডিম পাড়ছে। এমনকি দেখা গিয়েছে, এই দলের মুরগিদের মধ্যে রোগপীড়াও খুব কম।

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

# বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে পরিকল্পিত

২০ খণ্ডে সমাপ্য! ১৪টি খণ্ডে প্রকাশিত। মোট মূল্য ৩৪৫ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি কালে ২৫ টাকা এবং প্রতি খণ্ড সংগ্রহ কালে ১৬ টাকা দিতে হবে।

# বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি গ্রন্থ লিখছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩৬টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

**পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি**
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

৩১/২, ডঃ ধীরেন সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং এ্যাঞ্জেল প্রিণ্টার্স ৪৩এবি রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত।